

শারহুল আক্বীদা আত-ত্বাহীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১. তাওহীদের সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনে আবীল ইয় আল-হানাতী (রহিমাল্লাহু)

তাওহীদুল উলুহীয়া এবং তাওহীদুর রুবুবীয়াহ

তাওহীদ ইসলামের সর্বপ্রথম বিষয় এবং তাওহীদই ইসলামের সর্বশেষ বিষয়। এখানে তাওহীদ দ্বারা তাওহীদুল উলুহীয়াহ উদ্দেশ্য। কেননা সাধারণভাবে তাওহীদ শব্দটি ব্যবহার করলে তা দ্বারা তাওহীদুল উলুহীয়াহকেই বুঝায়। অথচ সালাফগণ কুরআন এবং হাদীছ অনুসন্ধান ও গবেষণা করে মোট তিন প্রকার তাওহীদের সন্ধান পেয়েছেন।

(১) আল্লাহ তা‘আলার সুউচ্চ গুণাবলী সম্পর্কিত তাওহীদ

(২) আল্লাহর রুবুবীয়াত সম্পর্কিত তাওহীদ। রুবুবীয়াতের মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তা‘আলাই প্রত্যেক জিনিসের একমাত্র স্রষ্টা, প্রভু এবং

(৩) তাওহীদুল উলুহীয়াহ। আর তা হলো এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলাই ইবাদতের একমাত্র হকদার। তার এবাদতে অন্য কোনো শরীক নেই।

প্রথম প্রকার তাওহীদ সম্পর্কে কথা হলো আল্লাহর সিফাতসমূহে অবিশ্বাসীরা তার সুউচ্চ সিফাতগুলোকে অস্বীকার করাকেই তাওহীদ হিসাবে নামকরণ করেছে। যেমন জাহাম বিন সাফওয়ান এবং তার অনুসারীরা আল্লাহ তা‘আলার সুউচ্চ গুণাবলীকে অস্বীকার করাকেই তাওহীদ হিসাবে নাম দিয়েছে। তারা বলেছে, আল্লাহ তা‘আলার জন্য একাধিক সিফাত সাব্যস্ত করা হলে একাধিক চিরস্থায়ী এবং অবিনশ্বর সত্তার অস্তিত্ব আবশ্যিক হয়। বোধশক্তির দলীল জাহামের কথাটিকে বাতিল সাব্যস্ত করে। কেননা সিফাত ছাড়া মস্তিস্কের বাইরে কোনো সত্তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।[1] মস্তিস্ক কখনো কখনো অসম্ভব এবং অবাস্তব বস্তু সাব্যস্ত ও কল্পনা করে। কিন্তু বাস্তবে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

আল্লাহর সিফাতসমূহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে জাহমীয়াদের কথা খুবই ক্ষতিকর। কারণ স্রষ্টার সিফাতকে অস্বীকার করার মাযহাব থেকেই সর্বেশ্বরবাদের জন্ম নিয়েছে। আর এ মাযহাব দু’টি খৃষ্টানদের কুফরীর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট। কেননা খৃষ্টানরা শুধু ঈসা আলাইহিস সালামের মধ্যে আল্লাহর অবতরণের আক্বীদাহ পোষণ করে। আর এরা বলে সবকিছুর মধ্যেই আল্লাহ তা‘আলা অবতরণ করেন। জাহমীয়াদের তাওহীদের সমর্থন করার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের সকল লোকই ছিল পূর্ণ ঈমানদার এবং তাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলার প্রকৃত মারেফত হাসিল হয়েছিল। তারা মারেফতের সাগরেই ডুবে মরেছিল। নাউযুবিল্লাহ

জাহমীয়ারা যে ধরণের তাওহীদে বিশ্বাসী, তার মধ্যে এও রয়েছে যে, মূর্তিপূজকরাও হকের উপর আছে। তারা মূর্তির ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করছে; অন্য কারো নয়।[2]

জাহমীয়াদের তাওহীদের মাসআলা সমূহের মধ্যে এও রয়েছে যে, মা কিংবা বোন এবং দূরের মহিলাদেরকে বিবাহ করার ব্যাপারে হালাল-হারামের কোনো পার্থক্য নেই। এমনি পানি ও মদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং বিবাহের মাধ্যমে জ্বীসহবাস করা কিংবা যেনা করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এসব কিছুকেই এক চোখে

দেখতে হবে; শুধু তাই নয়, সবই এক। তাদের তাওহীদের অংশ এটিও যে, নাবীগণ প্রশস্ত বিষয়গুলো মানুষের উপর সংকীর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের কথার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে।

দ্বিতীয় প্রকার তাওহীদ হলো আল্লাহর রুবুবীয়াত সম্পর্কিত তাওহীদ। আর তা হলো, এ স্বীকারোক্তি প্রদান করা যে, আল্লাহ তা‘আলাই সবকিছুর স্রষ্টা। সৃষ্টিজগতের এমন একাধিক স্রষ্টা নেই, যারা গুণাবলী ও কর্মসমূহে পরস্পর সমপর্যায়ের। এ প্রকার তাওহীদ সত্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই। অনেক কালামশাস্ত্রবিদ, যুক্তিবিদ এবং একদল সুফীর নিকট এ প্রকার তাওহীদই মূল উদ্দেশ্য। বনী আদমের মধ্যে প্রসিদ্ধ কোনো দল এ প্রকার তাওহীদকে অস্বীকার করেনি। বরং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টির অস্তিত্বকে মানুষের অন্তর-এ যেভাবে স্বীকৃত দেয়, তার চেয়ে আরো বেশী স্বীকৃতি প্রদান করে তাওহীদে রুবুবীয়াহ এর প্রতি।

আল্লাহ তা‘আলা তার রসূলদের সম্পর্কে সূরা ইবরাহীমের ১০ নং আয়াতে বলেন,

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

“তাদের রসূলগণ বলেছেন, আল্লাহর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে কি, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা?”

স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে যারা অজ্ঞ ছিল এবং যারা প্রকাশ্যে তা অস্বীকার করেছিল, তাদের মধ্যে ফেরআউনের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তবে সেও গোপনে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। যেমন মুসা আলাইহিস সালাম ফেরআউনকে বলেছিল,

﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَائِرٍ وَإِنِّي لَأُظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾

“তুমি অবশ্যই জানো এ প্রজ্ঞাময় নিদর্শনগুলো আকাশ ও পৃথিবীর রব ছাড়া আর কেউ নাযিল করেননি। হে ফেরাউন! আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয় একজন হতভাগ্য ব্যক্তি”। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১০২) আল্লাহ তা‘আলা ফেরআউন এবং তার সম্পর্কে আরো বলেন,

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾

“তারা একেবারেই অন্যায়ভাবে এবং অহংকারের সাথে নিদর্শনগুলো অস্বীকার করলো অথচ তাদের এ মগজ সেগুলোর সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল, তা দেখে নাও”। (সূরা আন নামাল ২৭:১৪)

এ জন্যই ফেরাউন যখন স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনেও না জানার ভান করে অস্বীকারের সুরে বলেছিল, وما رب العالمين; “কে সেই সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক?” তবে সে গোপনে আল্লাহর রুবুবীয়াতের প্রতি ঈমান রাখতো। যেমন মুসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনকে বলেছিল,

﴿قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۖ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۚ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۚ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۚ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾

“মূসা জবাব দিল, তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রব এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে যা কিছু আছে সেগুলোর রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনকারী হও। ফেরাউন তার আশপাশের লোকদের বললো, তোমরা শুনছো তো? মূসা বললো, তোমাদেরও রব এবং তোমাদের ঐসব বাপ-দাদারও রব, যারা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ফেরাউন বললো, তোমাদের কাছে প্রেরিত রসূল তো দেখছি একেবারেই পাগল। মূসা বললো, পূর্ব ও পশ্চিম এবং যা কিছু

তার মাঝখানে আছে তিনি সবার রব, যদি তোমরা কিছু বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী হতে”। (সূরা আশ শূরা ৪২:২৪-২৮)

এক শ্রেণীর লোক মনে করেছে যে, ফেরাউন মুসাকে স্রষ্টার হাকীকত, সিফাত ও প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। আর স্রষ্টার যেহেতু কোনো সিফাত, হাকীকত ও প্রকৃত অবস্থা ছিল না, তাই মুসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের সামনে স্রষ্টার সিফাত ও প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে অক্ষম হয়েছিলেন।

তাদের এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। মূলতঃ ফেরাউন সত্য প্রত্যাখ্যান ও তা কবুল করতে অস্বীকার করার জন্যই মুসা আলাইহিস সালামকে প্রশ্ন করেছিল। কুরআনের আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, ফেরাউন আল্লাহর প্রতি কুফরী করেছিল এবং তার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিল। সে আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করতো না যে, সে আল্লাহর সিফাত ও প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানার আবেদন করতে পারে। এ জন্যই মুসা আলাইহিস সালাম ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিল, আল্লাহ তা‘আলার পরিচয় খুবই সুস্পষ্ট। আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তার রুবুবীয়াতের প্রমাণাদি এত সুস্পষ্ট যে, তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করার কোন দরকার নেই। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এতই পরিচিত, প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট যে, তার সম্পর্কে অজ্ঞতার কোনো স্থান নেই। প্রত্যেক পরিচিত ও সুস্পষ্ট বিষয়ের তুলনায় স্রষ্টার মারেফতই সৃষ্টির প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

কোনো সম্প্রদায় সম্পর্কেই জানা যায়নি যে, সৃষ্টিজগতের জন্য পরস্পর সমান গুণাবলী ও কার্যাবলী সম্পন্ন দু’জন স্রষ্টা রয়েছে। অগ্নিপূজকদের ‘ছানুবীয়া’ এবং মানুবীয়া সম্প্রদায় দু’স্রষ্টায় বিশ্বাসী। তারা আলো এবং অন্ধকারকে স্রষ্টা মনে করে। তারা আরো বলে এ দু’স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্টিজগতের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। তবে তারা সকলেই একমত যে, আলো অন্ধকারের চেয়ে ভালো। আলোই প্রশংসিত মাবুদ। আর অন্ধকার হলো নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয়। তবে তারা অন্ধকারের ব্যাপারে মতভেদ করেছে। সেটিও আলোর মত অবিনশ্বর ও চিরন্তন সত্তা কি না, এ ব্যাপারে পরস্পর মতভেদ করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তারা সমান মর্যাদাসম্পন্ন দু’জন রবের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করেনি।

যেসব খ্রিষ্টান তিন মাবুদের অস্তিত্বে এবং তিন মাবুদের ইবাদতে বিশ্বাসী, তারা সৃষ্টিজগতের জন্য এমন তিন প্রভুর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে না, যাদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র-স্বনির্ভর ও পরস্পর আলাদা। বরং তারা সকলেই একমত যে, সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা একজন মাত্র। তাই তারা কাজ-কর্ম শুরু করার পূর্বে বলে থাকে, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে শুরু করছি। উপাস্য মাত্র একক সত্তা। তত্ত্ববাদ সম্পর্কে তাদের কথা মূলতঃই পরস্পর সাংঘর্ষিক।

ঈসা আলাইহিস সালামের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে তাদের কথা আরো বেশি ভ্রান্ত। এ জন্যই স্রষ্টা সম্পর্কে তাদের বুঝ এলোমেলো। স্রষ্টার পরিচয় তুলে ধরতেও তারা এলোমেলো কথা বলে থাকে। তাদের কেউ স্রষ্টা সম্পর্কে এমন কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করে না, যার অর্থ বোধগম্য এবং খৃষ্টানদের দুইজন এক কথায় একমতও হতে পারে না। তারা বলে, তিনি স্বীয় সত্তায় এক, মূলে তিন। তারা কখনো কখনো মূলনীতিগুলোকে বিশেষ বিশেষ স্বভাব, কখনো স্রষ্টার বিভিন্ন গুণাবলী এবং কখনো বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করে থাকে।

ভালোভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে দেখা যায়, আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদেরকে এ কথাগুলো ভুল হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করার যোগ্যতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। মোটকথা তারা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ দুই স্রষ্টা সাব্যস্ত করে না।

এখানে উদ্দেশ্য হলো, কোনো সম্প্রদায়ই সৃষ্টিজগতের জন্য পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ দুই স্রষ্টায় বিশ্বাস করে না। অথচ অনেক কালামশাস্ত্রবিদ, যুক্তিবিদ এবং দার্শনিক এক স্রষ্টার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। তাদের

কেউ কেউ বোধশক্তির দ্বারা একক স্রষ্টা সাব্যস্ত করার প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে নিজের অক্ষমতার স্বীকৃতি দিয়েছে। পরিশেষে সে ধারণা করেছে যে, আসমানী কিতাবের দলীল থেকেই স্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হবে।

তবে যুক্তিবিদ ও কালামশাস্ত্র বিদগণের প্রসিদ্ধ মত এ যে, বোধশক্তির দলীল দ্বারাই এক আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করতে হবে। আর তা এ যে, সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা যদি দুই হয়ে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে মতভেদ হওয়ার সময় তাদের এক স্রষ্টা কোনো একটি সৃষ্টিকে নড়াতে চাইলে এবং অন্য স্রষ্টা সে সৃষ্টিকে স্থির রাখতে চাইলে অথবা তাদের এক স্রষ্টা তাকে জীবিত রাখতে চাইলে এবং অপর স্রষ্টা তাকে মেরে ফেলতে চাইলে সম্ভবত দুই মাবুদের ইচ্ছাই জয়ী হবে অথবা তাদের এক স্রষ্টার উদ্দেশ্য সফল হবে কিংবা কারো ইচ্ছাই পূরণ হবে না।

প্রথমটি অসম্ভব। কেননা এতে পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি বিষয় একসাথে মিলিত হওয়া আবশ্যিক হয়। তৃতীয়টিও অসম্ভব। কেননা তাতে মানুষের শরীর নড়াচড়া করা এবং স্থির হওয়া থেকেও মুক্ত হওয়া আবশ্যিক করে। আর এটি অসম্ভব। সেই সাথে প্রত্যেক স্রষ্টার অক্ষমতাও প্রমাণিত হয়। অক্ষম কখনো মাবুদ হতে পারে না।

আর যখন দুই স্রষ্টার মধ্যকার এক স্রষ্টার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবে এবং অন্যটির উদ্দেশ্য পূরণ হবে না, তখন সক্ষম স্রষ্টাই মাবুদ হিসাবে গণ্য হবেন এবং অন্য অক্ষম স্রষ্টা উলুহীয়াতের হকদার হওয়ার অযোগ্য হবে। উপরোক্ত মূলনীতিটি সম্পর্কে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অনেক যুক্তিবিদ ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থই হলো বোধশক্তির দলীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

“যদি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকতো, তবে আসমান-যমীন বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র”। (সূরা আল আশ্বীয়া ২১:২২)

কেননা তাদের বিশ্বাস হলো, তারা যেই তাওহীদে রুবুবীয়াত সাব্যস্ত করেছে তা হলো সেই তাওহীদে উলুহীয়াহ, যার বর্ণনা রয়েছে কুরআনে। রসূলগণ এ তাওহীদের দিকেই আহ্বান জানিয়েছেন। মূলত বিষয়টি এ রকম নয়। বরং রসূলগণ যে প্রকার তাওহীদের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং যে বিষয়ের দাওয়াতসহ আসমানী কিতাবগুলো নাযিল হয়েছে, তা হলো তাওহীদুল উলুহীয়াহ। তবে ইহা তাওহীদে রুবুবীয়াকেও আবশ্যিক করে।

তাওহীদে উলুহীয়াতের অর্থ হলো এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা, তার কোনো শরীক নেই। আরবের মুশরিকরা তাওহীদে রুবুবীয়াকে স্বীকার করতো। এ বিশ্বাস করাও তাওহীদে রুবুবীয়াতের অন্তর্ভুক্ত যে, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

“এবং তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করো কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন? তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। (সূরা লুকমান: ২৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

“তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা জানো তাহলে বলো এ পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা বাস করে তা কার? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহর। বলো, তাহলে তোমরা ভয় করছো না কেন?” (সূরা মুমিনুন: ৮৪-৮৫)

এ রকম আয়াত কুরআনে অনেক রয়েছে। মক্কার মুশরিকরা এ বিশ্বাস করতো না যে, তাদের মূর্তিগুলো সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার কাজে আল্লাহর অংশীদার। বরং তাদের অবস্থা ভারতীয়, তুর্কী, বারবার এবং অন্যান্য মুশরিক জাতির মতোই ছিল। তারা কখনো কখনো মনে করতো তাদের মূর্তিগুলো নাবী-রসূল এবং সৎ লোকদের ছবি ছাড়া অন্য কিছু নয়। তারা এগুলোকে আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এটিই ছিল আরবদের শিরকের মূল বিষয়। আল্লাহ তা‘আলা নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

“তারা বলেছে: তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করো না এবং পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুথ, ইয়াউক ও নসরকে” (সূরা নূহ: ২৩)।

ছহীহ বুখারী এবং তাফসীরের কিতাবসমূহ, নাবীদের ঘটনাসমূহ এবং অন্যান্য কিতাবসমূহে ছহীহ সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সালাফ হতে বর্ণিত হয়েছে, উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তারা বলেছেন, এগুলো হচ্ছে নূহ আলাইহিস সালামের জাতির সৎ লোকদের নাম। এ সংব্যক্তিগণ যখন মারা গেল তখন তাদের অনুসারীরা তাদের কবরের উপর অবস্থান করতে লাগলো। অতঃপর তাদের মূর্তি নির্মাণ করল। এভাবে যখন দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হলো, তখন তারা এ মূর্তিগুলোর ইবাদত শুরু করে দিলো। এ মূর্তিগুলো হুবহু আরব গোত্রগুলোর কাছে পৌঁছেছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি একটি করে গোত্রগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন।

ছহীহ মুসলিমে আবুল হাইয়াজ আল-আসাদী হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা আমাকে বললেন,

أَلَا أُبْعُثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرِي أَنْ لَا أَدْعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتُهَا وَلَا تَدْعَنَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ

‘আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবো না, যে কাজে স্বয়ং রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন, কোন প্রাণীর ছবি দেখলেই তা বিলুপ্ত না করে ছাড়বে না। আর কোনো উচু কবরকে মাটির সমান না করে ছাড়বে না’।[৩]

ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মৃত্যু শয্যায় থাকা অবস্থায় বলেছেন,

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحْذَرُ مَا صَنَعُوا قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرَزَ قَبْرُهُ وَلَكِنْ كَرِهَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا

“ইহুদী-খৃষ্টানদের প্রতি আল্লাহর লা‘নত। তারা তাদের নাবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে। ইহুদী-নাসারাদের শিকী কাজ থেকে মুমিনদেরকে সতর্ক করাই ছিল এ কথার উদ্দেশ্য। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কবরকে ইবাদতখানায় পরিণত করার আশঙ্কা না থাকলে তার কবরকে উঁচু স্থানে উন্মুক্ত রাখা হতো। কিন্তু তার কবরকে মসজিদে পরিণত করা হবে, এটি তিনি অপছন্দ করেছেন”।[৪]

ছহীহ বুখারীতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত ছিলেন,

তখন হাবশার একটি গীর্জার কথা তার সামনে বর্ণনা করা হলো। গীর্জাটির সৌন্দর্য এবং তাতে যেসব ছবি ছিল সেগুলোর কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন,

إِنَّ أَوْلَيْكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ
أَوْلَيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“তারা এমন লোক, তাদের মধ্যে যখন কোনো নেককার ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করতো, তখন তারা তার কবরের উপর মসজিদ তৈরী করতো এবং মসজিদে ঐগুলো স্থাপন করতো। এরাই হচ্ছে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক।

ছহীহ মুসলিমে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে বলেছেন,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنُهَاكُمُ عَنْ
ذَلِكَ

“সাবধান, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের নাবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করছি” [5]

যেসব কারণে পৃথিবীতে শির্ক এসেছে, তার মধ্যে তারকা পূজা এবং তারকা সমূহের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যমীনে সেগুলোর নামে মূর্তি তৈরী করা। বলা হয়ে থাকে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের গোত্রের শির্ক ছিল এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এমনি ফেরেশতা ও জিনদেরকেও তারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করতো এবং তাদের নামে মূর্তি বানাতো।

এ সব মুশরিক স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করতো এবং তারা কখনোই এ কথা বলতো না যে, সৃষ্টিজগতের দু’স্রষ্টা রয়েছে। কিন্তু তারা আল্লাহর মাঝে এবং তাদের নিজেদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করে নিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

“যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তারা বলে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়”। (সূরা যুমার: ৩) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِئُوكَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ
فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করেছে তারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছো যার কথা তিনি আকাশেও জানেন না এবং যমীনেও না! তারা যে শির্ক করে তা থেকে তিনি পবিত্র এবং তার বহু উর্ধ্বে (সূরা ইউনুস: ১৮)।

এমনি অবস্থা ছিল পূর্বের এসব মুশরিক জাতির যারা রসূলদেরকে মিথ্যায়ন করেছিল। আল্লাহ তা‘আলা সালেহ আলাইহিস সালামের ঘটনায় তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের নয়জন শক্তিশালী লোক শপথ করে

বলেছিল, আমরা রাতের বেলায় অতর্কিত হামলা করে সালাহ এবং তার পরিবারের লোকদেরকে হত্যা করে ফেলবো। এ ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুশরিকরা তাদের নাবী এবং নাবীর পরিবারকে হত্যা করার জন্য শপথ করেছিল। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তারা বর্তমান সময়ের মুশরিকদের ঈমানের মতই আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন করতো।

>

ফুটনোট

[1]. শুধু তাই নয়; আমরা যদি নশ্বর এ পৃথিবীর দিকে তাকাই, তাহলে এখানকার প্রত্যেকটি অস্তিত্বশীল বস্তুরই দু'টি দিক রয়েছে। একটি তার দেহ, আকৃতি বা গঠন এবং অন্যটি হচ্ছে সেই বস্তুর বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও গুণাগুণ। মানুষেরও রয়েছে দেহ বা শরীর এবং রয়েছে তার সিফাত ও গুণাগুণ। একজন মানুষের একাধিক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তার মানে এ নয় যে, বাস্তবেই একজন মানুষের বহু ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। সুতরাং সিফাত ছাড়া যেহেতু কোনো সৃষ্টিই অস্তিত্বশীল নয়; তাই কেউ যদি বলে আল্লাহ আছেন, কিন্তু তার সিফাত নেই, তাতে আল্লাহর অস্তিত্ব না থাকা আবশ্যক হয়। নাউযুবিল্লাহ। সুতরাং বিবেক-বোধশক্তি, বাস্তবতা এবং শরীয়াতের দলীল দ্বারা জাহমীয়াদের কথা বাতিল হয়েছে।

[2]. স্রষ্টার বড়ত্ব, মহত্ব, তার অসীম জ্ঞান, সকল সৃষ্টির উপর তার ক্ষমতা, মাখলুকের প্রতি তার অমুখাপেক্ষীতা এবং সকল দিক থেকে সৃষ্টির উপরে হওয়া ইত্যাদি সুউচ্চ সিফাতকে অস্বীকার করার কারণেই তারা স্রষ্টাকে নগণ্য সৃষ্টির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে একাকার করে ফেলেছে।

[3]. ছহীহ মুসলিম হা/৯৬৯, নাসায়ী, অধ্যায়: কবর মাটির সাথে সমান করে দেয়ার আদেশ, হা/ ২০৩১।

[4]. ছহীহ বুখারী হা/৪৩৫, ছহীহ মুসলিম হা/৫৩১। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর অসুস্থতা ও তার মৃত্যু।

[5]. ছহীহ মুসলিম হা/৫৩২, অধ্যায়: কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা নিষেধ।